কুরআন-সুন্নাহর আলোকে
হকপন্থী উলামায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য
(২য় খণ্ড)

উস্তায ইবরাহীম হাসান

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে
হকপন্থী উলামায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য
(২য় খণ্ড)

উস্তায ইবরাহীম হাসান

[2]

সূচিপত্র
১৩. সবর ও শোকর 5
১৪. সময়ের হিফাজত (হিফজুল আওকাত): 7
১৫. জিহাদের তরে জান-মালের নিঃশর্ত কুরবানী - 9
১৬. দ্বীনকে নিজের মতের উপর প্রাধান্য দেওয়া 10
১৭. গায়রত ও ইস্তিগনা 11
১৮. শুরা বা পরামর্শ-ভিত্তিক কর্মপদ্ধতি 12
১৯. পরনিন্দা ও গীবত থেকে জিহ্বাকে সুরক্ষা 13
২০. ফিতনার সময় হকের স্পষ্ট উচ্চারণ 15
২১. মৃত্যুচিন্তা ও আখেরাত-কেন্দ্রিক জীবন 16
২২. তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী ও নব্য জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে আপসহীন 17
২৩. ফাসলুল খিতাব 18
২৪. উম্মাহর দুঃখে ব্যথিত হৃদয় 19

[3]

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له . وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

أمَّا بعد؛

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾.

“হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করো। এবং অবশ্যই মুসমিল না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না ”। (সূরা আলে ইমরান : ১০২)

নব্যুয়তের নূর যখন আঁধারে নিমজ্জিত পৃথিবীকে প্রথম স্পর্শ করেছিল , তখন থেকেই শুরু হয়েছিল সত্য ও মিথ্যার এক অবিরাম সংঘাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র সাহচর্যে এমন এক সোনালি কাফেলা তৈরি করেছিলেন , যাঁরা কেবল ইলমের ধারক ছিলেন না , বরং ছিলেন হকের পাহাড়। সেই মহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে যুগে যুগে ‘উলামায়ে রব্বানী ’ বা হকপন্থী উলামায়ে কেরাম আবির্ভূত হয়েছেন —যাঁরা বাতিলের আস্ফালনের সামনে কখনো মাথানত করেননি , যাঁদের কলম ও জবান ক্ষমতার মোহে কখনো বিক্রি হয়নি।

“কুরআন-সুন্নাহর আলোকে হকপন্থী উলামায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য : ১ম পর্ব ”-এ আমরা দেখেছিলাম হকের পথে চলা সেই কাফেলার মৌলিক ভিত্তিগুলো। তাঁদের অন্তরের ইখলাস ও আধ্যাত্মিক গভীরতা , আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত খাশইয়াত , ইলম ও আমলের সেই অভিন্ন ও দুর্লভ সমন্বয় আমাদের হৃদয়ে নতুন করে ঈমানি উদ্দীপনা জাগিয়েছিল। আমরা আরও অনুধাবন করেছিলাম — কীভাবে তাঁরা আমর বিল মা ’রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারে অবতীর্ণ হন, কীভাবে জালেম শাসকের বিলাসিতাকে তুচ্ছ করে জিহাদ ও কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ্ -র

[4]

কণ্টকাকীর্ণ পথ বেছে নেন এবং কীভাবে যুহদ, বিনয় ও মখলুকের প্রতি মমতা দিয়ে তাঁরা মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নেন। সেই সাথে তাঁদের বাসিরাত বা দূরদর্শিতা এবং সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসরণ তাঁদের দিয়েছিল এক অনন্য উচ্চতা।

কিন্তু বর্তমানের এই ফিতনাসংকুল সময়ে, যখন বাতিলের রূপ বহুবিধ ও ছদ্মবেশী এবং হকের পথ অত্যন্ত কণ্টকাকীর্ণ, তখন এই রাহবারদের চেনার মানদণ্ডগুলো আরও গভীরভাবে অনুধাবন করা আমাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হকপন্থী আলেম কেবল তিনি নন, যিনি নিছক কিতাবের পৃষ্ঠায় দক্ষ বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ তর্কে পারদর্শী; বরং তিনি—যাঁর চরিত্রে মিশে আছে নববী গায়রাত ও আপসহীন তেজ, যাঁর হৃদয়ে অহর্নিশ স্পন্দিত হয় বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর নাড়ির ব্যথা, এবং যাঁর বজ্রকণ্ঠ বাতিলের তখতে কাঁপন ধরানো এক অবিনাশী স্পর্ধা। প্রথম পর্বের সেই আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আজ দ্বিতীয় পর্বে আমরা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো উন্মোচন করব, যা একজন আলেমকে কেবল একজন পণ্ডিতের গণ্ডি থেকে বের করে ইসলামী ইতিহাসের মহান বীর এবং আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সার্থক উত্তরসূরির মর্যাদায় আসীন করে।

চলুন, হকের সেই আলোকবর্তিকাগুলোর আরও কিছু অবিচ্ছেদ্য ও বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্য আমরা হৃদয়াঙ্গম করি। আল্লাহ তায়ালা লেখক-পাঠক উভয়কেই ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাত দান করুন, আমীন।

১৩. সবর ও শোকর

হকের এই সুদীর্ঘ পথ কখনোই মসৃণ কোনো পুষ্পশয্যা ছিল না, বরং ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে এ পথ এক বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ অভিযাত্রা হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছে। যুগে যুগে যারা সত্যের এই মহান ঝাণ্ডা বয়ে নিয়ে গেছেন, তাঁদের ললাটে কখনো জুটেছে শাসকগোষ্ঠীর রোষানল, কখনো কারাবরণের নিঃসঙ্গ প্রহর, আবার কখনো বা চরম অর্থাভাবের নিদারুণ কষাঘাত। তবে একজন প্রকৃত হকপন্থী রব্বানী আলেম বা দাঈর অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো—তিনি সংকটের এই উত্তাল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে কখনোই ধ্রুবতারা হারান না। তিনি বিচলিত হন না এই ভেবে যে, তাঁর রব কি তাঁকে ভুলে গেলেন? বরং তিনি অন্তরের অন্তস্থল থেকে বিশ্বাস করেন যে, এই নিবিড় মেঘমালার আড়ালেই লুকিয়ে আছে [5]

[illegible], [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

যখন বাতিলের পক্ষ থেকে নির্মম আঘাত আসে, তখন একজন খাঁটি ঈমানদার একে কোনো বিপর্যয় মনে না করে বরং আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের এক দুর্লভ সুযোগ হিসেবে আলিঙ্গন করেন। অন্ধকার কারাপ্রকোষ্ঠের অসহনীয় নির্জনতা তখন তাঁর কাছে রবের সাথে নিভৃতে অনুরাগের এক আধ্যাত্মিক নিকেতন হয়ে ওঠে। দারিদ্র্যের কশাঘাত তাঁর কাছে হয়ে ওঠে নফসের লালসার শিকল ভেঙে দেওয়ার এক অব্যর্থ হাতিয়ার। ঠিক তেমনিভাবে, যখন পার্থিব সাফল্যের স্বর্ণশিখরে তিনি আসীন হন, তখন নিজেকে ‘সবজান্তা’ বা ‘সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী’ ভেবে তিনি সত্যভ্রষ্ট হন না। তিনি সর্বদা সজাগ থাকেন এই ভেবে যে, এই সমস্ত নেয়ামত কেবলই আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া এক পবিত্র আমানত। ফলে তাঁর প্রতিটি আচরণে দম্ভের পরিবর্তে প্রকাশ পায় বিনয়ের এক স্নিগ্ধ আভা। হকের এই কণ্টকাকীর্ণ পথে সবর হলো মুমিনের দুর্ভেদ্য বর্ম, আর শোকর হলো তাঁর গন্তব্যে পৌঁছানোর অবিনাশী চালিকাশক্তি। এই দুই গুণের অপূর্ব সমন্বয় যার চরিত্রে সার্থক হয়ে ওঠে, শয়তান তাকে তাঁর আদর্শিক লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। বিপদের ঝঞ্ঝাবাতে তিনি পাহাড়ের মতো অটল, আর সুখের প্রাচুর্যে তিনি ফলবতী বৃক্ষের মতো নুয়ে পড়া এক প্রশান্ত ও স্থিতধী পথিক।

১৪. সময়ের হিফাজত (হিফজুল আওকাত):

একজন হক্কানী-রব্বানী আলেমের জীবনদর্শন জাগতিক লাভ-ক্ষতির তুচ্ছ মাপে রচিত হয় না; বরং তাঁর কাছে প্রতিটি মুহূর্ত মহান রবের পক্ষ থেকে গচ্ছিত এক অমূল্য মহিমান্বিত আমানত। তিনি হৃদয়ের গহীন থেকে অনুভব করেন যে, তাঁর আয়ুষ্কালের প্রতিটি পলক, প্রতিটি নিঃশ্বাস কেবল তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি নয়, বরং তা উম্মাহর প্রতি এক বিশাল দায়বদ্ধতা। তাই সময়ের অপচয় তাঁর কাছে কেবল আলস্য নয়, বরং এক প্রকার রুহানি দহন এবং খিয়ানততুল্য অপরাধ। মুখরোচক আড্ডা, অন্তঃসারশূন্য তর্ক কিংবা লক্ষ্যহীন কর্মতৎপরতায় লিপ্ত হয়ে তিনি এই আমানত নষ্ট হতে দেন না। বরং তিনি হায়াতের প্রতিটি মুহূর্ত থেকে বরকতের মণি-মুক্তো কুড়িয়ে নিয়ে গড়ে তোলেন তাঁর ইলমি ও আমলি সাম্রাজ্য।

সময়ের এই অনন্য সংরক্ষণ বা ‘হিফজুল আওকাত’-এর ক্ষেত্রে পূর্বসূরি সালাফদের জীবন ছিল বিস্ময়কর ও কিংবদন্তিতুল্য। ইমাম ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ'র জীবনী পাঠ করলে আমরা এক [7]

[illegible] [illegible] [illegible] [

বা 'হিফজুল আওকাত' কেবল সময়ের শাসন নয়, বরং এটিই হলো ইহকাল ও পরকালের সফলতার একমাত্র চাবিকাঠি।

১৫. জিহাদের তরে জান -মালের নিঃশর্ত কুরবানী -

হকপন্থী রব্বানী আলেমের জীবন কেবল তাত্ত্বিক পাঠদান কিংবা ফতোয়ার কিতাবে সীমাবদ্ধ কোনো যান্ত্রিক অস্তিত্ব নয়; বরং তাঁর সমগ্র সত্তা হলো খোদায়ী প্রেমে সিক্ত এক জীবন্ত কুরবানি। তিনি যখন হকের নিশান হাতে রাজপথে কিংবা রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি তাঁর জান ও মাল কে জান্নাতের বিনিময়ে আরশের অধিপতির কাছে চিরতরে বিক্রি করে দিয়েছেন। তাঁর এই কুরবানী কেবল মিম্বরের বাগ্মিতা নয়, বরং বাতিলের তপ্ত বুলেটের সামনে বুক পেতে দেওয়ার এক অবিনাশী স্পর্ধা। তিনি জানেন, দ্বীনের বাগান যখন শুকিয়ে যায়, তখন তা কেবল বক্তৃতার বারিধারায় সজীব হয় না; বরং সেখানে নিজের কলিজার তাজা রক্ত ঢেলে দিতে হয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুমিনদের এই মহিমান্বিত কেনাবেচা সম্পর্কে ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, অতঃপর তারা (শত্রুকে) মারে এবং (নিজেরাও) শহীদ হয়।”
(সূরা আত-তাওবাহ: ১১১)

একজন প্রকৃত আলেমের কাছে দুনিয়ার কোনো রক্তচক্ষু কিংবা শাসকের কারাগার ভীতির উদ্রেক করে না; কারণ তাঁর হৃদয়ের মণিকোঠায় প্রজ্জ্বলিত থাকে শাহাদাতের পরম আকাঙ্ক্ষা। তিনি উম্মাহকে হাতে-কলমে এই সবক দেন যে—যখন ইসলামের সুউচ্চ মিনার ধূলিসাৎ হতে চায়, যখন তাওহীদের পতাকা ভূলুণ্ঠিত হয়, তখন মাদরাসার নিরাপদ দেয়াল, পারিবারিক স্নিগ্ধতা আর ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে হিজরত ও জিহাদের কণ্টকাকীর্ণ ময়দানই হয় তাঁর চিরচেনা ঠিকানা। তাঁর কাছে ইলমের পাঠশালা আর শাহাদাতের রণাঙ্গন ভিন্ন কোনো পথ নয়, বরং একই মঞ্জিলের দুটি অবিচ্ছেদ্য বাঁক।

[9]

[illegible] [illegible] [illegible] [

নিষ্ঠার পরিচয়। কারণ তাঁর লক্ষ্য নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, মানুষ নিজের রাজনৈতিক দর্শন, সাংগঠনিক স্বার্থ কিংবা সামাজিক ঐতিহ্যের খাতিরে দ্বীনের বিধানকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু হকপন্থী উলামাগণ এই স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন যে, দ্বীন কোনো আপসের বস্তু নয়। তাঁরা শিখিয়ে দেন যে, বুদ্ধি বা যুক্তি দিয়ে দ্বীন মাপা যাবে না; বরং দ্বীন দিয়েই বুদ্ধির সংশোধন করতে হবে।

এই গুণটিই একজন আলেমকে সাধারণ পণ্ডিত থেকে আলাদা করে দেয়। তাঁর এই নিঃশর্ত আনুগত্য দেখে সাধারণ মানুষও শিখতে পারে যে, ইসলামের মূল সৌন্দর্য হলো 'তাসলিম' বা আত্মসমর্পণ। যখন একজন আলেম নিজের খেয়াল-খুশির ঊর্ধ্বে উঠে দ্বীনকে স্থান দেন, তখনই তাঁর দাওয়াতে বরকত আসে এবং উম্মাহর মধ্যে একনিষ্ঠতার চর্চা শুরু হয়।

১৭. গায়রত ও ইস্তিগনা

একজন হক্কানি-রব্বানী আলেমের অনন্য ভূষণ হলো তাঁর গায়রত এবং মানুষের সম্পদের প্রতি চরম অমুখাপেক্ষিতা বা ‘ইস্তিগনা’। তিনি তাঁর অর্জিত ইলমকে কখনো উদরপূর্তির মাধ্যম বা বৈষয়িক লাভের হাতিয়ার বানান না। তাঁর ললাট কেবল মহান রবের সিজদাতেই অবনত হয়; কোনো রাজা-বাদশাহর দরবারে কিংবা ধনকুবেরদের করুণা লাভের আশায় তিনি নিজেকে বিলিয়ে দেন না। এই চারিত্রিক দৃঢ়তাই তাকে বাতিলের সামনে দাঁড়িয়ে আপসহীনভাবে সত্য উচ্চারণের সাহস জোগায়। তিনি ধ্রুব সত্যের মতো বিশ্বাস করেন—বিলাসবহুল পরাধীনতার চেয়ে অভাবী আত্মমর্যাদা হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ ও সম্মানের।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা এই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুমিনদের প্রশংসা করে ইরশাদ করেছেন:

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ

“অজ্ঞ লোকেরা তাদের আত্মমর্যাদাবোধের **(**অযাচিত সওয়াল না করার**)** কারণে তাদেরকে ধনী মনে করে।**”** (সূরা আল-বাকারা : ২৭৩)

একজন প্রকৃত আলেমের শান এমনই যে, তাঁর অভাব থাকলেও তিনি তা প্রকাশ করে বেড়ান না। ফলে বাইরের লোক তাঁর গাম্ভীর্য ও

[11]

[illegible] [illegible] [illegible] [

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

“এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাদের **(**সাহাবীদের **)** সাথে পরামর্শ করুন। ”
(সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)

উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম মানুষ হওয়া সত্ত্বেও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি পরামর্শের মুখাপেক্ষী হন , তবে একজন সাধারণ আলেমের জন্য তা আরও বেশি জরুরি। পরামর্শের মাধ্যমে মানুষের মেধার সমন্বয় ঘটে এবং ব্যক্তিগত খামখেয়ালি বা ভুল সিদ্ধান্তের আশঙ্কা বহুলাংশে হ্রাস পায়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সফল মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে সূরা আশ -শূরা নামক একটি স্বতন্ত্র সূরা নাযিল করেছেন। সেখানে তিনি মুমিনদের প্রশংসা করে বলেন :

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“এবং তাদের **(**মুমিনদের **)** কাজগুলো পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। ”
(সূরা আশ-শূরা : ৩৮)

হকপন্থী আলেমের অন্যতম বড় পরিচয় হলো তিনি অন্য আলেমদের মতামতের কদর করেন। তিনি জানেন যে , একাধিক হৃদয়ের ঐকমত্যে আল্লাহর সাহায্য ত্বরান্বিত হয়। পরামর্শের এই সংস্কৃতি আলেমদের মাঝে ঐক্য সুদৃঢ় করে এবং উম্মাহর সামনে একটি ইনসাফপূর্ণ ও শক্তিশালী কর্মপদ্ধতি উপস্থাপন করে। যে সিদ্ধান্তে পরামর্শ থাকে , সেখানে ব্যর্থতা আসলেও আফসোস থাকে না ; কারণ তা ছিল সম্মিলিত প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ। একজন রব্বানী আলেম এই 'শুরা ' বা পরামর্শের মাধ্যমেই দ্বীনের আমানত রক্ষা করেন।

১৯. পরনিন্দা ও গীবত থেকে জিহ্বাকে সুরক্ষা

একজন রব্বানী আলেমের জিহ্বা হলো জিকির ও হিকমতের আধার। তিনি অন্যের সম্মানহানি করার মতো নিচু মানসিকতা থেকে যোজন

[13]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] [illegible] [

২১. মৃত্যুচিন্তা ও আখেরাত -কেন্দ্রিক জীবন

হকপন্থী আলেমের প্রতিটি স্পন্দন, প্রতিটি শব্দ এবং প্রতিটি পদক্ষেপের নেপথ্যে থাকে পরকালের জবাবদিহিতার ভয়। তিনি এই নশ্বর পৃথিবীর চাকচিক্য বা সাময়িক খ্যাতির পেছনে মোহগ্রস্ত হয়ে ছুটেন না। তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা আবর্তিত হয় কবরের প্রথম রাত এবং কিয়ামতের সেই ভয়াবহ হিসাবকে কেন্দ্র করে। তাঁর বয়ান কেবল তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, বরং তাতে আখেরাতের এক গভীর প্রভাব ফুটে ওঠে—যা পাষাণ হৃদয়েও কম্পন সৃষ্টি করে। তিনি জানেন যে, আজ যা অর্জন করছেন তার প্রকৃত মূল্য নির্ধারিত হবে পরপারে।

পার্থিব জীবনের অসারতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন:

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

“আর পার্থিব জীবন কেবল ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।”
(সূরা আলে ইমরান : ১৮৫)

এই ধ্রুব সত্যটি একজন রব্বানী আলেমের মজ্জাগত। তিনি মৃত্যুকে কেবল জীবনের সমাপ্তি নয়, বরং মহান রবের সাথে সাক্ষাতের প্রবেশদ্বার মনে করেন। তাই তিনি সর্বদা নিজেকে এবং উম্মাহকে প্রস্তুত রাখেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের প্রকৃত বাস্তবতা স্মরণে রাখার তাকিদ দিয়ে বলেছেন:

أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ

“তোমরা স্বাদ বিনষ্টকারী বিষয় অর্থাৎ মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করো।”
(সুনানে তিরমিজি : ২৩০৭)

মৃত্যুচিন্তা একজন আলেমকে দুনিয়াদারির লোভ থেকে মুক্ত করে একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের খেদমত করার হিম্মত দান করে। তাঁর অন্তরে সর্বদা এই চেতনা জাগ্রত থাকে যে, পার্থিব সম্পদ ও পদমর্যাদা সবই ক্ষণস্থায়ী, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টিই অবিনশ্বর।

[16]

২২. তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী ও নব্য জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে আপসহীন

একজন রব্বানী আলেমের দাওয়াতের মূল ভিত্তি এবং তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম মিশন হলো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’—অর্থাৎ বিশুদ্ধ তাওহীদ। তিনি উম্মাহর ঈমানি আকিদাকে মাজারপূজা, পীরপূজা কিংবা ব্যক্তিপূজার মতো শিরক থেকে যেমন রক্ষা করেন, তেমনি আধুনিক যুগের চটকদার কুফরি মতবাদ ও ‘ইজম’গুলোর পঙ্কিলতা থেকেও সুরক্ষায় অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করেন। তাঁর সংগ্রামের মূল লক্ষ্য হলো মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে বের করে এক আল্লাহর নিরঙ্কুশ গোলামিতে ফিরিয়ে আনা।

তিনি উম্মাহকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন যে, শিরক কেবল মূর্তিপূজায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং আল্লাহর আইনকে উপেক্ষা করে মানুষের তৈরি গণতন্ত্র (Democracy), ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism) এবং ভৌগোলিক সীমারেখাভিত্তিক সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ (Nationalism)-□□ ইবাদত করাও নব্য জাহিলিয়াতের অংশ। তিনি ঘোষণা করেন যে, আইনদাতা ও বিধানদাতা হিসেবে একমাত্র আল্লাহকে মেনে নেওয়াই তাওহীদের অবিচ্ছেদ্য দাবি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শিরকের ভয়াবহতা বর্ণনা করে বলেন:

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

নিশ্চয়ই শিরক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম।” (সূরা লোকমান : ১৩)“

হকপন্থী আলেম জানেন যে, আকিদাহ কলুষিত হলে এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্বের (হাকিমিয়্যাহ) সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করলে কোনো আমলই আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে শিরকের ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন:

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

“ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের ওপর আল্লাহর লানত, তারা তাদের নবীদের কবরকে সেজদাহগাহ বানিয়ে নিয়েছে।” (সহীহ বুখারী : ৪৩৫)

[17]

একজন রব্বানী আলেম কেবল কবরের শিরক নিয়ে সরব নন, বরং তিনি প্রাসাদের শিরক ও মতাদর্শিক শিরকের বিরুদ্ধেও সমভাবে সোচ্চার। তিনি সমাজ থেকে কুসংস্কার ও বিদআতের শিকড় উপড়ে ফেলার পাশাপাশি পাশ্চাত্য থেকে আমদানিকৃত মানবরচিত মতবাদগুলোকে চূর্ণ করে ঈমানের পবিত্রতা রক্ষা করেন। তাঁর দাওয়াতের মূল সুর হলো—সাহায্যকারী, বিধানদাতা এবং ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ। তাঁর এই বলিষ্ঠ অবস্থানের কারণেই উম্মাহ কিয়ামতের দিন এক আল্লাহর সামনে নিষ্কলুষ ঈমান নিয়ে দাঁড়ানোর সাহস সঞ্চয় করতে পারে।

২৩. ফাসলুল খিতাব

হকপন্থী রব্বানী আলেম ‘ফাসলুল খিতাব’ বা চূড়ান্ত মীমাংসাকারী প্রজ্ঞার অধিকারী, যিনি ধোঁয়াশাপূর্ণ মুহূর্তে সত্য ও মিথ্যার মাঝখানে এক অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর তুলে দেন। যখন সমাজে নানা ভ্রান্ত মতবাদ ও ছদ্মবেশী ফেতনার কালো মেঘ জমে, যখন সুবিধাবাদী আলিমরা শাসক বা পরিস্থিতির ভয়ে সত্যকে পাশ কাটিয়ে কৌশলের আশ্রয় নেয়, তখন তিনি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর সেই শাশ্বত তলোয়ার হাতে ময়দানে নামেন। তাঁর প্রতিটি শব্দ তখন সত্যের কষ্টিপাথর হয়ে দাঁড়ায়; যা মেকি চাকচিক্য ধুয়ে-মুছে আসলি হাকিকতকে উন্মোচিত করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বাতিলের মস্তক চূর্ণকারী হকের প্রকৃতি বর্ণনা করে বলেন:

بَاطِ ِل َ فيَدْ َم ُغ ُه َ فِإذَ ُ ا ه َو َ ز ِ اه ٌق

ِّق َ علَى الْ

َح
ِالْ

بَ ْل نَ ْق ِذ ُف ب

“বরং আমি সত্যকে মিথ্যার ওপর নিক্ষেপ করি, অতঃপর তা মিথ্যার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে যায়।” (সূরা আল-আম্বিয়া: ১৮)

এই পবিত্র বাণীর তেজের উত্তরাধিকারী হয়ে একজন হকপন্থী আলেম কখনোই কোনো মেকি বা কৃত্রিম ঐক্যের দোহাই দিয়ে সত্যের সাথে মিথ্যার কোনো প্রকার ‘কো-এক্সিস্টেন্স’ বা সহাবস্থান মেনে নেন না। তিনি জানেন, দুধের সাথে নাপাকি মেশালে তা আর দুধ থাকে না, বরং পুরোটা নাপাকিতেই পরিণত হয়। তাই তিনি আপসকামিতার পথ মাড়িয়ে ‘লা তালবিসুল হাক্কা বিল বাতিল’ (সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না)—এই আসমানী আদেশের জীবন্ত প্রতীকে পরিণত হন। তাঁর কণ্ঠস্বর যখন গর্জে

[18]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

বিভক্তির দেয়ালে কুঠারাঘাত করে সবাইকে এক দেহ ও এক প্রাণে পরিণত করার নিরন্তর জিহাদে রত থাকেন। তাঁর এই আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক অভিভাবকত্বের সুশীতল ছায়ায় উম্মাহর মাজলুমরা খুঁজে পায় এক চূড়ান্ত নির্ভরতা ও আশ্রয়ের ঠিকানা।

হকপন্থী উলামায়ে কেরাম হলেন ইতিহাসের সেই অবিস্মরণীয় কাফেলা, যাঁরা পৃথিবীর ধূলিকণায় মিশে গেলেও তাঁদের আদর্শের সুবাস যুগ যুগ ধরে উম্মাহকে পথ দেখায়। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে শুরু করে বর্তমানের হকপন্থী উলামাগণ। তাঁদের কারণেই ইসলাম আজও তার মৌলিকরূপে টিকে আছে। মহান আল্লাহ আমাদের এই রব্বানী উলামাদের চেনার এবং তাঁদের ছায়াতলে থেকে দ্বীনের পথে অবিচল থাকার তৌফিক দান করুন। আমীন।

[20]